ভাত

হিতেশবাবু ভাত খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাঁহার ক্ষুদ্র ফ্ল্যাটবাড়ি হইতে ভাত রান্নার পাট উঠিয়া গিয়াছে। এমন কি পাড়ার একমেবাদ্বিতী-য়ম্ অন্নপূর্ণা রেস্টুরেন্ট হইতে রাঁধা ভাতের আমদানীও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অথচ প্রৌঢ়, চিরকুমার হিতেশবাবু উপরিলিখিত অন্নপূর্ণার অন্নেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া আসিয়াছেন এতকাল।

তাঁহার কম্বাইণ্ড-হ্যাণ্ড দুলুচাঁদ জনতা স্টোভে কোনমতে দুপুরের ঝোল ভাতটা নামাইয়া দেয়। তবে দুলুচাঁদের রান্না দৈনিক একবারের বেশী হিতেশবাবুর ধাতে সহ্য হয় না। তাই রাত্রের খাবার - ঝোলভাত - অ্যালুমিনিয়ামের টিফিন কেরিয়ারে ভরিয়া দুলুচাঁদই প্রতিদিন নিয়া আসে। অন্নপূর্ণার সঙ্গে বাঁধা বন্দোবস্ত করিয়া নিয়াছেন হিতেশবাবু। অ্যালুমিনিয়ামের টিফিন কেরিয়ারটিও এই উদ্দেশ্যেই ক্রয় করিয়াছিলেন। মাসান্তে সারা মাসের পয়সা চুকাইয়া দেন। বহু বৎসর ধরিয়া এই ব্যবস্থা চলিয়া আসিয়াছে। সেই নূতন টিফিন কেরিয়ার অতি-ব্যবহারে বাঁকিয়া চুরিয়া গিয়াছে। ত্যাবড়ানো ডিবেগুলো ভালভাবে বসে না, বাঁকা ডাঁটির ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া আসে। সুতলি দিয়া বাঁধিয়া আটকাইতে হয়। এক কথায় উহার জীবন শেষ হইয়া গিয়াছে। উহাকে ত্যাগ করার সময় হইয়াছে। কিন্তু হিতেশবাবু টিফিন কেরিয়ার ত্যাগ না করিয়া অন্ন ত্যাগ করিলেন। টিফিন কেরিয়ারের প্রয়োজন ফুরাইলো।

দুলুচাঁদ শাল পাতার চ্যাঙাড়িতে কচুরি-তরকারী লইয়া আসে। খাইয়া হিতেশবাবুর পেট ভুটভাট করে। প্রায় প্রতি রাত্রেই জেলুসিল ট্যাব্‌লেট্ সেবন করিতে হয়। কিন্তু রাত্রে রুটি বানাইবার কথাটা মুখ ফুটিয়া তিনি কিছুতেই দুলুচাঁদকে বলিতে পারেন না। তাঁহার বড় সঙ্কোচ হয়। ভাতের পাট উঠিয়া যাওয়ায় দুপুরে মাছের ঝোল রুটি সহযোগে খাইয়া থাকেন। রুটি বানাইতে ভৃত্যের অনিচ্ছা হিতেশবাবুর অগোচর নয়। তবু যে সে অনিচ্ছাটুকু চাপিয়া রাখিয়া দুলুচাঁদ প্রতি দ্বিপ্রহরে তাঁহার

জন্য চারখানি রুটি তৈয়ার করিয়া দিতেছে তাহাই হিতেশবাবু যথেষ্ট বলিয়া মনে করেন। বিশেষত দুপুরে কর্তার জন্য রুটি বরাদ্দ হওয়ায় দুলুচাঁদকে বেশ কিছু অসুবিধা পোয়াইতে হইতেছে।

দুলুচাঁদ সাঁওতাল পরগণার অধিবাসী। কৈশোরে হিতেশবাবুর সহিত কলিকাতায় পদার্পণ করিয়া এখন সে অশনে, বসনে, চিন্তাধারায় পুরাপুরি বাঙালী হইয়া উঠিয়াছে। হিতেশবাবুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অন্ন ত্যাগ করার কথা সে চিন্তাও করিতে পারে না। ফলে আজকাল দুই বেলাই তাহাকে অন্নগ্রহণের জন্য অন্নপূর্ণার শরণ লইতে হয়। ইহাতে হিতেশবাবুর সংসার খরচ বাড়িয়া গিয়াছে। দুপুরে বাড়িতে মাছের ঝোল রুটি বানাইয়া রাখিয়া দুলুচাঁদকে হোটেলের ঝোলভাত খাইতে হয়, কারণ বাড়ির রান্না মাছের ঝোল সঙ্গে করিয়া হোটেলে নিয়া গিয়া সেখানকার ভাতে মাখিয়া খাওয়ার নিয়ম নাই। অন্যদিকে হোটেলের ভাত বাড়িতে আনা সম্বন্ধেও হিতেশবাবুর প্রবল কড়াকড়ি। যে কোন প্রকার ভাতের জন্য হিতেশবাবুর ফ্ল্যাটবাড়িটি এখন নিষিদ্ধ এলাকা হইয়া গিয়াছে।

এই হাভাতের দেশে এরূপ ব্যবস্থা অভিনব হইলেও অসুবিধাগুলি নগণ্য নয়। তবুও হিতেশবাবুর মত একজন প্রবীণ বিচক্ষণ ব্যক্তি কেন যে নিজের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা ভাঙিয়া এবং নিত্যনৈমিত্তিক অম্বল, অজীর্ণ, বায়ুর তাড়না সহ্য করিয়া উক্ত ব্যবস্থাটিকে আঁকড়াইয়া রহিলেন তাহার কারণ জানিতে হইলে পাঠক, আপনাকে কালের কাঁটাটিকে কয়েক মাস পিছাইয়া দিতে হইবে ----।

শীতের সন্ধ্যা। ফ্ল্যাটের বাতি জ্বালানো হয় নাই। হিতেশবাবু অফিসের পোশাকেই শয্যার উপর দুই পা জড়ো করিয়া বসিয়া আছেন। শালুর লেপটি আলগাভাবে গায়ে জড়ানো। দুলুচাঁদ তাহার মাসিক বরাদ্দ সিনেমা দেখিতে গিয়াছে। ফিরিতে রাত হইবে। হিতেশবাবুর জন্য মাছের ঝোল ভাত টেবিলে ঢাকা দিয়া রাখিয়া গিয়াছে। হিতেশবাবুর মন ভাল নাই। যা দিনকাল পড়িয়াছে, তাহাতে মন মেজাজ ভাল রাখা বোধকরি কাহারও পক্ষে সহজ নয়। হিতেশবাবুর মত সৎ ও সরল মানুষ, যিনি বইয়ে পড়া আদর্শগুলিতে এযাবৎ নির্বিচারে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে দেশের বর্তমান হালচাল ও গতিপথ ক্রমশই দুর্বোধ্য ও ভয়াবহ হইয়া উঠিতেছে। অফিসে বড় সাহেব আজ তাঁহার প্রতি বিশেষ

অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এমন কি অধস্তন কর্মচারীদের সমক্ষেই নানা কটু কথা শুনাইয়াছেন। অথচ হিতেশবাবুর কোন দোষ নাই।

কোম্পানির পুরাতন সাপ্লাইয়ার ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা যে কোম্পানিকে নিকৃষ্ট মাল পাচার করিয়া পয়সা মারিতেছে, হিতেশবাবু সপ্রমান সেই তথ্যটিই বড় সাহেব সকাশে উপস্থিত করিয়াছিলেন। মনে স্থির বিশ্বাস ছিল যে বড় সাহেব তাঁহার এই কষ্টলব্ধ আবিষ্কারের জন্য কৃতজ্ঞচিত্তে সাধুবাদ করিবেন যেহেতু কোম্পানির বহুল ক্ষতির পথ বন্ধ হইবে এতদ্বারা। হায়রে দুরাশা। সাধুবাদ ! কৃতজ্ঞতা ! বড় সাহেবের বিদ্রূপবাণী স্মরণ করিয়া পুনরায় হিতেশবাবুর কর্ণমূল আরক্ত হইয়া উঠিল। হিতেশবাবুকে তিনি বিশেষভাবে উপদেশ দিয়াছেন অযথা অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারে নাসিকা প্রবিষ্ট না করিয়া আপন চরখায় তৈল প্রয়োগে আত্মনিয়োগ করিতে। এবং সায়াহ্নে অফিস ত্যাগের পূর্বেই বড় সাহেব কর্তৃক ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালাকে নূতন কন্ট্র্যাক্ট প্রদানের বার্তাও হিতেশবাবুর কর্ণগোচর হইয়াছে।

হিতেশবাবু পা ঘুরাইয়া পদ্মাসনের ভঙ্গিতে বসিলেন। লেপখানি মাথার উপর দিয়া সর্বাঙ্গে জড়াইয়া নিলেন। সহকর্মী ভূপেন হাজরার সান্ত্বনাবাণী মনে পড়িল, "এদেশে সততার ঠাঁই নেই মশাই। একেবারে গোল্লায় গেছে দেশটা। আমি মশাই আর ক'বছরের মধ্যেই ক্যানাডা চলে যাবো। এই গড্ ফরসেকন্ প্লেসে মানুষ থাকে?" গড্ ফর্‌সেকন্ প্লেস, ঈশ্বর-বিবর্জিত স্থান। অথচ যখন ত্রিংশ কোটি দেশবাসী দ্বিত্রিংশ কোটি ভুজ ঊর্ধ্বে তুলিয়া স্বদেশ জননীর বন্দনা করিতেছিল তখন দেশে দেবদেবীর সংখ্যা ছিল তেত্রিশ কোটি। অর্থাৎ মাথা পিছু একজন করিয়া দেবতা ধরিলেও কিছু উদ্বৃত্ত থাকিত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদের সংখ্যাও কি বাড়ে নাই? এই তো সেদিন গণেশের কন্যা সন্তোষীর কথা শুনিলেন। এইরূপ আরও বহু নবজাত দেবদেবী আছেন নিশ্চয়ই। এত কোটি দেবদেবী থাকা সত্ত্বেও দেশটা এইভাবে দুর্নীতি ও অরাজকতায় পূর্ণ হইল কি করিয়া, হিতেশবাবু দুই চক্ষু বুঁজিয়া সেই দুর্জ্ঞেয় রহস্যের সদুত্তর হাতড়াইতে লাগিলেন।

ফ্ল্যাটের অন্ধকার ও রাস্তার স্বল্প আলোকের মিশ্রণে ঘরে আধো অন্ধকারের মায়াজাল। শয্যার উপর লেপাবৃত হিতেশবাবুকে দেখিয়া

যুগযুগান্তব্যাপী তপস্যারত ঋষি বাল্মীকি বলিয়া ভ্রম হইতেছে। কতক্ষণ কাটিয়া গেল। নিকটবর্তী গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া এগারোটা বাজিল। শ্রীমান দুলুচাঁদ আজও হাউস-ফুল থাকায় সন্ধ্যার টিকিট পায় নাই। মধ্যরাত্রির শো-তে বসিয়াছে। অন্য দিন হইলে হিতেশবাবু নির্জন কামরায় বসিয়া অনুপস্থিত দুলুচাঁদের উদ্দেশে এমন অনেক কথা বলিতেন যাহা তাহাকে সম্মুখে বলিবার সাহস বা দুর্বুদ্ধি তাঁহার কখনই হয় না। কিন্তু আজ আর তিনি কোন দিকে দৃকপাত অথবা কর্ণপাত করিলেন না। একমনে এই দেবদেবী অধ্যুষিত দেশের বর্তমান অবনতি ও ভবিষ্যৎ ভয়াবহ পরিণতির চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন।

আরও খানিকক্ষণ এইভাবে কাটিল। সহসা হিতেশবাবু চক্ষু উন্মীলিত করিয়া নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন। শোবার ঘরের দরজা খোলা ছিল। দরজার বাহিরে ঢাকা বারান্দার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। বারান্দার এক কোনে দেয়াল ঘেঁষিয়া একটি ছায়ামূর্তি দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলেন। এ পাড়ায় চোর ছ্যাঁচোড়ের উপদ্রব বড় একটা শোনা যায় না। বোধহয় ত্যাবড়ানো টিফিন-কেরিয়ার, জীর্ণ লেপ-তোষক ও গুটিকয় কম দামী পোশাক-আশাকের জন্য পাঁচিল টপকাইতে আজকালকার বিলাসী চোরেরা প্রস্তুত নয় বলিয়াই। যাহা হউক, এই মুহূর্তে চোরের ভয় হিতেশবাবুর মনে স্থান পাইল না। তিনি সেইভাবে পদ্মাসনে বসিয়াই কহিলেন, "কে?"

বারান্দার কোনে ছায়ামূর্তি নড়িয়া উঠিল। জড়সড় কণ্ঠে কিছু কহিল। হিতেশবাবু ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ? কে ওখানে?"

ছায়ামূর্তি শয়নঘরের দরজার সমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "আমি। একটু বাইরে এস বাবাজী।"

লেপের উষ্ণতা ত্যাগ করিয়া উঠিতে মন চাহিতেছিল না। তাছাড়া এতক্ষণের ঐশ্বরিক চিন্তায় হিতেশবাবুর মন তখন অন্য জগতে বিচরণ করিতেছে। তাই তিনি নির্ভীক কণ্ঠে কহিলেন, "তুমি কে? ভিতরে এস।"

ছায়ামূর্তি ঘরের ভিতর এক পা রাখিল। টেবিলে ঢাকা দেওয়া ভাতের থালার প্রতি নজর পড়িতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকিয়া ছিটকাইয়া বারান্দায় সরিয়া গেল, "আমার ওখানে যাবার উপায় নেই বাবাজী। তুমি একটু বাইরে এস।"

অগত্যা হিতেশবাবু উঠিলেন। লেপ সরাইয়া নীচে নামিলেন। চটিতে পা গলাইয়া বারান্দায় আসিয়া সুইচ টিপিলেন, কিন্তু আলো জ্বলিল না। রাস্তার আলোগুলিও সব এক সঙ্গে নিভিয়া গেল।

অন্ধকারে আগন্তুকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চারিদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। কলিকাতার এই পাড়াটিকে কেহ যেন মসীপাত্রে চুবাইয়া তুলিয়াছে। কিন্তু সেই অন্ধকারেও আগন্তুককে দেখিতে অসুবিধা হইল না। শ্মশ্রুগুম্ফ সম্বলিত দীর্ঘ দেহ। একদা গৌর বর্ণ - ঝড়ে, জলে, রৌদ্রে, অযত্নে, অনশনে রুক্ষ মলিন। জীর্ণ, অপরিচ্ছন্ন কম্বলে সর্বাঙ্গ আবৃত থাকিলেও কি এক অপার্থিব দ্যুতি তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে।

হিতেশবাবুর জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে আগন্তুক কম্বলটি এক টানে খুলিয়া মাটিতে রাখিল। হিতেশবাবুর সর্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, আনন্দাশ্রুআপ্লুত বদনে গদগদ স্বরে জয়ধ্বনি করিয়া আগন্তুকের পাদদেশে পতিত হইলেন। আগন্তুক একটু তফাতে সরিয়া গিয়া শীর্ণ বাহু তুলিয়া অভয়-ভঙ্গি করিল।

তারপর আবেগ কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "বৎস হিতেশ, ওঠ। তুমি ঠিকই ধরিয়াছ। আমি মহাদেব। তবে দেবতাদের দিন গিয়াছে। কাজেই আমারও মহত্ত্বের অবসান ঘটিয়াছে। তবু তোমার আহ্বানে সাড়া না দিয়া পারিলাম না। বাছা, তোমাকে দেওয়ার মত কিছুই আর নাই, কিন্তু পুরানো অভ্যাস ছাড়িতে পারি নাই। কেহ একাগ্রচিত্তে আধ্যাত্মিক চিন্তা করিলে এখনও সাড়া না দিয়া থাকিতে পারি না। ভদ্রতায় বাধে। যে সব প্রশ্ন তোমার মনকে নিয়ত খিন্ন করিতেছে, হয়তো সেগুলির সন্তোষজনক উত্তর আমি জোগাইতে সক্ষম, এই কথা চিন্তা করিয়াই তোমার কাছে আসিয়াছি, যদিও এতদূর আসিতে বেশ কষ্ট হইয়াছে ----।"

হিতেশবাবু বলিলেন, "বাবা, এখানে ঠাণ্ডা। আপনি ভিতরে গিয়া ভাল করিয়া বসুন।"

"না বাবাজী। ও ঘরে যাওয়ার সাধ্য আমার নাই। আমার সব কথা শুনিলেই বুঝিবে।" এই বলিয়া মহাদেব বারান্দায় উটকা হইয়া বসিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "দেবতাদের সাথে দানবের চিরন্তন শত্রুতার কথা তোমার অবিদিত নহে। যুগ যুগ ধরিয়া দুই শক্তির বিরোধ। দানবকুলের

উদগ্র বাসনা দেবতাদের স্বর্গচ্যুত করিয়া সেখানে দানবরাজ্য স্থাপন করে। কিন্তু তাদের এ দুরাশা এতদাবধি পূরণ হয় নাই। দেবতাদের বুদ্ধিকৌশলের কাছে বারংবার পরাজিত হইয়াছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শেষ রক্ষা হইল না ----।"

মহাদেব দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। তারপর বলিয়া চলিলেন, "রাজনীতি যুদ্ধবিগ্রহ এসকল ব্যাপারে আমার রুচি নাই। আমি সাধারণত এবংবিধ বিষয় নিয়া মাথা ঘামাই না। আমার নিজস্ব শৈলাবাসে কতিপয় অন্তরঙ্গ সহচরের সাহচর্যে দিন যাপন করি। স্বর্গের খবরাখবর সরবরাহ করিয়া আমার শান্তিভঙ্গ নিষেধ। স্বয়ং দেবরাজ এই নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছিলেন আমারই আগ্রহ এবং অনুরোধে। ফলে দেবকুলের বিপত্তির সংবাদ যথাসময়ে আমাকে কেহই জানায় নাই। যখন জানিতে পারিলাম তখন বড় দেরী হইয়া গিয়াছে। শুনিলাম দেবলোক ঝাঁটাইয়া দেবদেবীরা পলাইতেছে, আক্রমণকারীদের প্রতিরোধের চেষ্টাও আর কেহ করিতেছে না।

"কৌতূহলবশে একাই চলিলাম। তৃতীয় নেত্র মেলিয়া দূর পর্যন্ত চাহিয়া দেখিলাম এবং বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেলাম। ভীমকায় দানব নহে, খর্বাকৃতি শীর্ণদেহ এক দল মানুষ আগাইয়া আসিতেছে। কাহারও হাতে কোন অস্ত্রশস্ত্র দেখিলাম না। তাহারা শূন্যে হাত বাড়াইয়া দিতেছে আর দেবতারা রথে, গজে, অশ্বে চড়িয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইতেছে। আমি হতভম্ব হইয়া চাহিয়া রহিলাম। বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি হেলনে যাহাদের নস্যাৎ করা যায়, তাহাদের দেখিয়া ভয়ে পলায়নের হেতু বুঝিলাম না। পলায়নপর দেবতাদের ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু কেহই থামিল না। ইঙ্গিতে আমাকেও তাহাদের পদানুসরণের নির্দেশ দিয়া সবাই দলে দলে দূরে মিলাইয়া গেল।

"ক্রমে লোকগুলি নিকটে আসিল। দেখিলাম তাহাদের মধ্যস্থলে একজন একটি ক্ষুদ্র রেকাবীতে কিছু বহন করিতেছে। অন্য সকলে মাঝে মাঝে রেকাবীটি স্পর্শ করিতেছে এবং হাত উঁচাইয়া পলায়নপর দেবদেবীদের তাড়া করিতেছে। আমার কাছে আসিয়া লোকগুলি থামিল। তারপর আমাকে চিনিবামাত্র তাহারা রেকাবীর দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল, 'ওরে, শিবঠাকুর এসেছে।। শীগ্গীর ভাতের ছোঁয়া লাগিয়ে দে।

শকড়ি ছুঁইয়ে দে।' আমি একথা শুনিবামাত্র দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুট লাগাইলাম এবং ছুটিতে ছুটিতে স্বর্গের সীমানার পারে আসিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়া বাঁচিলাম।"

মহাদেব মুহূর্তকাল থামিলেন। তারপর বিষন্ন কণ্ঠে বলিলেন, "বাবাজী, এবার বুঝিবে এত কোটি দেবতা থাকা সত্ত্বেও কেন তাহারা দেবভূমি আর্যাবর্তের অবনতি রোধের কোনও প্রচেষ্টা করিতেছে না। বৎস, আমরা নিরুপায়। আমরা এদেশ স্পর্শ করিব কি করিয়া? এখনও কোনমতে শকড়ি বাঁচাইয়া টিকিয়া আছি। এভাবে আর কতদিন টিকিতে পারিব কে জানে?"